উপসংহার

উপসংহার

স্ত্রীলিঙ্গের ভূমিকা পিতৃতন্ত্রে কোনও কালেই গুরুত্ব পায়নি। নারীর জীবনচর্চা জীবনবোধ ইতিহাসচর্চার পিতৃতান্ত্রিক ঘরানায় চিরকালই গৌণ থেকেছে। ইতিহাসের সেই উপেক্ষিত পরিসর পূরণে নারীর স্বরচিত জীবনকথার ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। বাঙালি নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম রাসসুন্দরী দাসী (১৮০৯-১৯০০) গৃহকোণের আবদ্ধতার মধ্যেই জীবন কথা রচনা করে ইতিহাসে মৌনরূপী নারীর মিথকে ভাঙতে পেরেছিলেন। তারপর থেকে এই পথে সমাজের নানা প্রান্তের বাঙালি মেয়েরা এগিয়ে এসে নিজেদের হাতেই ইতিহাসের নতুন পাঠ রচনা করলেন।

সময়ের সংকট, সামাজিক বাধা, ব্যক্তিমনের সংশয় ও দ্বিধা এইসব কিছুকে লঙ্ঘন করার প্রচেষ্টা ছিল উনিশ শতকের প্রথম দিককার অন্তঃপুরবন্দি মেয়েদের আত্মকথার মধ্যে। রাসসুন্দরী মায়ের মৃত্যু শয্যায় পৌঁছতে না পেরে আত্মকথা '*আমার জীবন*' (১৮৭৬)-এ ক্ষোভের কথা লিখেছিলেন- *"আমার নারীকুলে কেন জন্ম হইয়াছিল? আমার জীবন ধিক্। ... এমন যে দুর্ল্লভ বস্তু মা, এই মায়ের সেবা করিতে পারি নাই। আহা আমার জীবন ধিক্। আহা আমার এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে? আমি যদি পুত্র-সন্তান হইতাম আর মা-র আসন্নকালের সম্বাদ পাইতাম, তবে আমি সেখানে খাকিতাম, পাখির মতো উড়িয়া যাইতাম। কি করিব, আমি পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী।"* (রাসসুন্দরী দাসী, আমার জীবন, বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ২০১১, দয়াদিল্লি, পৃ: ৩৩) পিতৃতন্ত্রের বেড়াজাল অতিক্রম করতে না পারলেও লিঙ্গ বৈষম্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন অনেকেই। কিন্তু কালের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদায়

ব্যক্তিত্বময়ী, সাধারণভাবেই পুরুষতন্ত্র নির্দিষ্ট মূল্যবোধের কঠিন নিগড় থেকে মুক্তি পথের সন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন। শিক্ষার সুযোগ লাভ করে তাঁদের মননে যে বৌদ্ধিক ভাবনার ছোঁয়া লাগে, সেই ছোঁয়াতেই বাড়তে থাকে তাঁদের পরিসর। অন্তঃপুরের বাইরের বৃহত্তর পৃথিবী সম্পর্কে মেয়েরা হয়ে উঠলেন উৎসাহী। মননে-চিন্তনে-বৌদ্ধিক ভাবনায়, সবদিক থেকেই, পরবর্তী প্রজন্ম পূর্বজাদের থেকে ব্যতিক্রমী। রাসসুন্দরী, নিস্তারিণী এঁরা সবাই নারী জীবনের দুর্দশার জন্য অনুযোগ জানিয়েছেন একমাত্র ঈশ্বরের কাছে, লিঙ্গ প্রভুদের কখনও আক্রমণ করেন নি। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মেয়েদের মধ্যে এই গন্ডি ভাঙতে দেখি। জ্ঞানদা দেবী কোনও পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই একা চলে গেছেন ব্রিটেনে। স্বর্ণকুমারী দেবী পা রাখলেন অন্তঃপুরের বাইরে। বেড়াতে গিয়েছিলেন দাদা সত্যেন্দ্র নাথের কর্মস্থলে। এদের পরবর্তী প্রজন্মের স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে পদার্থ বিদ্যা নিয়ে লেখাপড়া করলেন, মহীশূরে চাকরি করতে গিয়েছিলেন। হয়ে উঠে ছিলেন জাতীয়তাবাদী নেত্রী। সমসাময়িক সারদামঞ্জুরী দত্ত শিলং-এ চাকুরি করে একা হাতে সংসার সামলান। অতৃপ্ততা এদের মধ্যে সে ছিল সারদামঞ্জুরী দত্ত শিক্ষার সীমিত সুযোগ পেয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছেন মেয়েকে লেখা এক চিঠিতে লিখেছেন– *"আমার ইচ্ছা করে দেশের দুর্গতি দেখিয়া সর্বদা কাগজপত্রে ওই সব বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে, বক্তৃতা দ্বারা দেশের লোকের মন হইতে ভ্রম ও কুসংস্কার দূর করিতে। কিন্তু সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া এ সকল সাধ্য নহে।"* (ঈশিতা চক্রবর্তী, 'অন্দর থেকে বাহির, বাহির থেকে অন্দর : আত্মকথনে বাঙালি মেয়েরা (১৮০৯-১৯৩৪)', নারীবিশ্ব, পুলক চন্দ সম্পাদনা, , গাঙচিল, কলকাতা, পৃ: ৩৩৫)।

আসলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের নারীদের উদ্যোম ছিল প্রচণ্ড। সামান্যতম সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নারী আন্দোলনের ইতিহাসে এক অনন্য নজির তাঁরা স্থাপন করেছেন। এই ধারাবাহিকতাকেই এগিয়ে নিয়ে যান বিশ

শতকের বাঙালি মেয়েরা। লীলা মজুমদারের জন্ম বিখ্যাত রায় পরিবারে। শিক্ষা, সংস্কৃতি সচেতনতার পরিবেশেই তাঁর বড় হয়ে ওঠা। কিন্তু নিজের শিক্ষিত হয়ে উঠতে কিংবা সাহিত্যিক হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেতে তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়াসটিও ছিল প্রবল। ব্রাহ্ম সংস্কারপন্থী পরিবারের গণ্ডিবদ্ধ জীবন তিনি অস্বীকার করেন। পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে হিন্দুপাত্রকে বিবাহ করে চিরদিনের মত পিতার সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙেও নিজের যুক্তি-বিচার-বুদ্ধিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। পিতৃতন্ত্রের গোড়ামি তার কাছে কখনো প্রাধান্য পায়নি। ঘরের গণ্ডী পেরিয়ে নিজের পৃথিবী নিজেই গড়তে চেয়েছিলেন। পারিবারিক ঐতিহ্যকে সাহিত্যিক হিসাবে বহন করলেও তিনি তাঁকে এক উচ্চ মাত্রাতেই পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন।

প্রতিভা বসু বিখ্যাত সাহিত্যিকের স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সেই পরিচয়টির বাইরে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি উদ্যোমি হন। বিবাহ পরবর্তী জীবনে গানের চর্চা ছাড়লেও সাহিত্যিক হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন। আত্মকথায় পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের সমালোচনা করতে পরিবারের সদস্যদেরও ছেড়ে কথা বলেননি। মামার বিবাহকে কেন্দ্র করে পণ ব্যবস্থার সমালোচনা করছেন। আবার নিজের বিবাহের সময় এই মামার পাত্র নিয়ে স্বেচ্ছাচারী ব্যবহার মেনে না নিয়ে সমালোচনা করেছেন।

ছবি বসু, অনুরূপা বিশ্বাসের অনুপ্রবেশ চল্লিশের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক পটভূমিতে। পুরুষ অভিভাবকের সাহায্য বা উৎসাহ ছাড়াই ছবি বসুর রাজনীতিতে হাতেখড়ি। অন্তরের তাগিদেই আত্মকথাতে সেদিনের রাজনৈতিক আন্দোলনের যে পরিচয় দান করেছেন সেখানে নেতৃত্ব স্থানীয়দের করেছেন সেখানে নেতৃত্ব স্থানীয়দের ভজনা না করে সাধারনের উৎসাহ-উদ্দীপনা যাতনার আলেক্ষই রচনা করেছেন। অনুরূপা বিশ্বাসের ও তরুণী বয়সে রাজনীতিতে প্রবেশ অন্তরের তাগিতেই। নেতৃস্থানীয়দের ভজনা তিনিও করেননি, তাঁর আত্মকথায় বরং উঠে আসে নেতৃস্থানীয়দের পিতৃতান্ত্রিক মনোভাবের সমালোচনা। সেদিনের কমিউনিস্ট আন্দোলন ঘিরে সাধারণের উৎসাহ উদ্দীপনা

যাতনার কাহিনী তাঁর আত্মকথাতেও স্থান পায়। ব্রাহ্মণ পরিবারের গোড়ামিকে তুচ্ছ করে রাজনীতিতে উত্তরণ। অসবর্ণ বিবাহ। বিবাহ পরবর্তী জীবনেও আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সামিল হয়ে সংসারের দায়দায়িত্বের মাঝেও লেখাপড়া চালিয়ে এম. এ. পাস করে কলেজে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হওয়া। আবার বরাক উপত্যকার প্রান্তিক পরিসরে মেয়েদের সাহিত্যচর্চা-সাংগঠনিক কাজে এগিয়ে আসতে জীবন সায়াহ্নে এসেও 'বরাকনন্দিনী' র মত সামাজিক সংস্থার দায়িত্বগ্রহন তাঁর উদ্যোমী চরিত্রকেই তুলে ধরে। আত্মকথাতে মা-দিদি-নিকট আত্মীয়া মেয়েদের জীবনের কথা বলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার এক সংগ্রামী ইতিহাস রচনা করেছেন তিনি।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মেয়ে জয়া মিত্র সত্তরের দশকে উত্তাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সামিল হয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা খুঁজেছেন। পুলিশি দমনপীড়নের শিকার হয়ে তাঁর জেলে প্রবেশ। আত্মকথাতে জেল জীবনের স্মৃতিচারণ করেজেলবাসী মেয়েদের জীবনে পিতৃতান্ত্রিক শোষনের ইতিহাসকেই খুঁজতে চেয়েছেন। রাসসুন্দরী থেকে জয়া মিত্র সীমিত সংখ্যক হলেও এই নারীরাই *'History is her story too'* এই সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেন। আত্মকথা রচয়িতা নারীদের মাধ্যমেই আমরা প্রত্যক্ষ করি এক নতুন ভুবন, যে ভুবন নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা। এই ভুবনে স্থান পায় নারীর জগৎ নারীর মন, চাহিদা, পরিবার এবং সেই সঙ্গে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার একদেশদর্শিতা– সব কিছুই। বাংলাদেশে জ্ঞানচর্চার পুরুষকেন্দ্রীক ইতিহাসের বিনির্মাণ ঘটান এই নারীরা, সাহস দেখান পুরুষ-নির্দিষ্ট লিঙ্গ ভূমিকা অস্বীকার করার। মনে পড়ে কবির দুটি পঙক্তির কথা–

"আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাড়া

বুকের মাঝে বিশ্বলোকে পাবি সাড়া।''

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বলোকের আহ্বানে সাড়া দিতে পেরেছিলেন বলেই তো তারা ব্যতিক্রমী।